



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 897 - 906

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

রবীন্দ্র নাট্যসাহিত্যে ‘ডাকঘর’ : মৃত্যুচেতনা ও অন্তর্নিহিত দর্শন

কথাকালি গাঙ্গুলী

গবেষক, নাট্য বিভাগ

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID: gangulykathakali443@gmail.com



Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Rabindranath
Tagore,
Dakghar,
Life, Death,
Liberation,
Amal,
Nature,
Infinity, King,
Child.

Abstract

In 1322 Bangabd Rabindranath Tagore told Shantidev Ghosh that his mind would often grow restless under the shadow of an indefinable sense of separation. One day, seated upon the terrace of his Santiniketan residence, the poet felt a call to depart. This summons did not disturb him; rather, this call of death inspired him to write the play Dakghar. To Rabindranath, death never appeared as a source of anguish; instead, it resonated as a journey to infinity. He believed that the deepest truth of life is hidden in death.

Dakghar was written in 1911, during the phase of Gitanjali. The play emerged at an odd time with the poet's natural disposition. Tagore was then afflicted by physical and psychological distress. A nervous breakdown caused pain in his ear and the left side of his head. Though the medicine Aram relieved the physical pain, but its side effects like melancholy, anxiety, etc, intensified his mental discomfort. While Tagore ultimately overcame this condition through inner resilience and return to a normal life still the impact of this mental turbulence is clearly be seen in Dakghar.

By trying to escape the boundaries, the call of the road echoed in this play—a call towards liberation. In the same period, he was engaged in writing Jibansmriti, another testament to his introspective impulse. Freedom through nature emerged as the poet's paramount aspiration. We find a story of extraordinary emancipation through the every line in the play Dakghar.

Just as a small child finds freedom in a mother's lap, the poet's mind also wished to become childlike. To escape the pettiness of daily life, Tagore desired companionship with children—where the harsh shadows of reality cannot eclipse the present moment. In this sense, Amal becomes a translucent reflection of the poet himself. Hours pass inside Amal's confined room. He cannot move. Sudha comes to him with flowers—she represents movement, while Amal remains still. The conflict between home and road, enclosure and journey, resonates as the central thematic apprehension of Dakghar.

Critics and scholars have interpreted Rabindranath's play in diverse and questions have been raised. Questions persist: Is Dakghar a meditation on death or about liberation? Does it symbolize the union of the individual soul with the supreme soul, or does it rest upon some other philosophical foundation?

This Paper seeks to examine and elucidate these questions through critical analysis.

Discussion

সময়টা ১৩২২ বঙ্গাব্দ। শান্তিদেব ঘোষকে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন সেসময় প্রায়ই তাঁর মন চঞ্চল হয়ে উঠত এক অজানা বিচ্ছেদের আভাসে। একদিন শান্তিনিকেতনের বাড়ির ছাদে কবি মাদুর পেতে বসে আছেন, হঠাৎ অনুভব করলেন ছেড়ে যাওয়ার ডাক এসেছে। তাতে তিনি বিচলিত নন; বরং মৃত্যুর এই বাঁশিই তাঁকে দিয়ে লিখিয়ে নিল 'ডাকঘর'। তিনি চেয়েছেন চলে যাবার আগে অন্তত একবার গোটা পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে; এখানের মানুষের সুখ-দুঃখ, উচ্ছ্বাস, গতি শেষবারের মত অনুভব করতে। রবীন্দ্রনাথের কাছে মৃত্যুর এই আকস্মিক ডাক বেদনা হয়ে আসেনি, ধ্বনিত হয়েছিল অজানার প্রতি, অনন্তের প্রতি যাত্রা। তিনি মনে করতেন জীবনের একমাত্র সত্যরূপ মৃত্যুতেই লুকিয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথের এই মৃত্যুচেতনার সব থেকে অনন্য সৃষ্টি মাত্র ৩৯৯টি সংলাপে গ্রথিত 'ডাকঘর' নাটক। নাট্যস্রষ্টার কাছে মৃত্যু সুন্দর ও মহীয়ান হলেও এই নাটকের মৃত্যুর স্বরূপ আমাদের কাছে বিষাদময়। যদিও অমল নামের বাচ্চাটি জানেই না, সে যে রাজার চিঠির পানে চেয়ে বসে আছে, সেই রাজাই আছেন সুদূরের পারে।

এই নাটক মৃত্যুর না মুক্তির? নাকি জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন? নাকি অন্য কোনো স্থায়ী ভিত্তি রয়েছে 'ডাকঘর' প্রতিষ্ঠার পিছনে? নানান সমালোচক, বিশেষজ্ঞরা রবীন্দ্র নাটককে এক এক ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথের মনের নদীতে তখন কোন শৈল্পিক চিন্তার প্রবাহ চলছিল? আমরা জানি লিখিত অবস্থায় 'ডাকঘর' নাটকে প্রথমে চারটি গান (যদিও অন্তিম পাঠান্তর গান বর্জিত) ছিল, অভিনয়ের সময়ে সাতটি গান কবি রচনা করেন। শব্দ যখন চূপ করে যায় তখন সুর সেখানে অদৃশ্য কথা বসিয়ে নেয়। শুধুমাত্র 'ডাকঘর' নয়, 'শারদোৎসব' নাটক থেকে রবীন্দ্র মননের যে বিশেষ ভাব পরিবেশিত হয়েছে তা কেবল লিখিত পাঠে সীমাবদ্ধ না থেকে প্রযোজনার আঙ্গিনাতেও নিজস্ব শব্দ খুঁজে নিয়েছে।

'ডাকঘর' নাটক রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপরিভ্রমণ সূচিত। কবির মতে এই নাটক মৃত্যু ও মুক্তির এক লিরিকোচিত গদ্যরূপ। 'ডাকঘর' সৃষ্টি কবির যে চিন্তাচঞ্চলতার ফসল সে ব্যাপারে আমরা অবগত হলেও 'ডাকঘর' রচনার পূর্বে রবীন্দ্রনাথের জীবনে বারবার আত্মীয় বিয়োগ কবি জীবনকে বিষাদে ভরিয়ে তুলেছিল। তবু তাঁর প্রার্থনা ছিল প্রতিকূল পরিবেশে যেন সাহস বজায় থাকে, অবসাদ যেন গ্রাস না করে। তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র ছিল যা কিছু হারিয়েছে তাকে সহজে বরণ করে নেওয়ার ক্ষমতা।

১৯০২ খ্রিস্টাব্দে ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিক্ষার ক্ষেত্রে এক আশ্রমের পরিকল্পনা করলেও তা সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়নি। ওই বছরেই স্ত্রী মৃগালিনী দেবীর মৃত্যু কবিকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছিল 'স্মরণ' কাব্যগ্রন্থ। তখন জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথের বয়স ১৪, মীরা দেবীর বয়স ১০ এবং কনিষ্ঠ পুত্র শমীর বয়স ৮। এই ঘটনার পরে ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে যক্ষ্মা রোগে কন্যা রেনুকার মৃত্যু হয়। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে মারা যান দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে কবি লিখছেন, -

“সংসারে তরণীটি নানপ্রকার তুফানের উপর দিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছি - কবে একটা বন্দরে টেনে এনে নোঙর ফেলতে পারব জানি নে। ছেলেদের মধ্যে কেউ একদিকে, কেউ আর - এক দিকে, আমার বিদ্যালয় এক দিকে এবং আমি আধিব্যাধি নিয়ে অন্য দিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে চলেছি। বিচ্ছিন্ন সংসারটাকে এক জায়গায় জমাট করে নিয়ে বসবার জন্য মন ব্যাকুল হয়েছে।”^৬

তাঁর লেখা চিঠি থেকে মনের অবস্থা আন্দাজ করা কঠিন নয়। রবীন্দ্রনাথ আটকে পড়েছিলেন নিত্যনৈমিত্তিক নিয়মের জালে। বদ্ধ দেওয়াল ভেদ করে তিনি শুনতে চাইছিলেন মুক্তির ডাক। যে ডাক বাস্তবে রূপ নিল কবির 'শিশু'

কাব্যগ্রন্থে। মুণালিনী দেবী যখন শয্যাশায়ী ছিলেন শমীন্দ্রনাথ নেহাৎ শিশু। মা ও ছোট ছেলের যে আত্মিক বন্ধন এবং মায়ের কাছে ছেলে যেভাবে মুক্তি পায় তা কবি চোখের সামনে বেড়ে উঠতে দেখেছিলেন। পরিপার্শ্বের এত কোলাহলে কবি মনও চেয়েছিল এক শিশুর বাসযোগ্য হয়ে উঠতে। রোজকার দিনের হীনতা থেকে ছুটির আশায় রবীন্দ্রনাথ শিশুদের দলে থাকতে চেয়েছিলেন যেখানে বাস্তবতার করাল ছায়া মুহূর্তকে অন্ধকারে ডুবিয়ে নিতে পারে না। কিন্তু, ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় আক্রান্ত হয়ে শমীন্দ্রনাথ মারা যান। একের পর এক প্রিয়জনহানি কবিকে বেদনাসিক্ত করে তুলেছিল। তা সত্ত্বেও, নিয়মিত সমস্ত কাজে মুহূর্তের জন্যেও ভাঁটা আসতে দেননি। তাঁর ব্যবহারিক প্রকাশে দুঃখের রূপ ছিল মার্জিত। এরপরই ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে ‘শারদোৎসব’ নাটক রচনার মাধ্যমে এক নতুন ধরণ নিয়ে এলেন নাটকের চরিত্র নির্মাণে। নিজে হয়ে উঠলেন ছেলে খেপাবার ঠাকুরদা। জীবনের যে বদ্ধতা থেকে মুক্তি চাইছিলেন, সেই অভিকরণে গড়ে তুললেন নাটকের কাঠামো। খেয়াল করলে দেখা যায় ‘বাগ্মণিক প্রভিতা’ থেকে ‘মালিনী’ নাটক লেখার পরে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘদিন আর কোনো নাটক লেখেন নি। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে ‘শারদোৎসব’ রচনার পরে যে নাটকগুলি তিনি লিখেছেন তাতে এসে পড়েছে ঋতুর অনুষ্ণ। ‘শারদোৎসব’ শরৎ ঋতুর নাটক, ‘রাজা’ ও ‘ফাল্গুনী’ বসন্তের, ‘অচলায়তন’ বর্ষাকালের নাটক। ‘শারদোৎসব’ থেকে ‘ফাল্গুনী’ পর্যন্ত রবীন্দ্র নাটককে ভালো ভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে প্রত্যেকটা নাটকের ভিতরকার মূল বক্তব্য এক। প্রত্যেক নাটকেই রবীন্দ্রনাথ ছদ্মবেশের অনুষ্ণ এনেছেন এবং ঠাকুরদা ও রাজা চরিত্র দুটি সহজ জীবনের কথা বলার জন্য এবং চেতনার অন্ধকারে আলোর পথ দেখাতে বারে বারে ফিরে এসেছে। শেক্সপিয়ারের একজন অনুরক্ত পাঠক হিসাবেই হয়ত তিনি ছদ্মবেশকে তাঁর নাটকে গুরুত্ব দিয়েছেন। আমরা জানি অভিনয়ের সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরদা চরিত্রে অভিনয় করতেন। ‘ডাকঘর’ এ ঠাকুরদা এবং ফকিরের চরিত্রে তিনি অভিনয় করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ‘ফাল্গুনী’ নাটকের ঠাকুরদা চরিত্রে অভিনয়ের সময় রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ হাতে একতারা নিয়ে নেচে উঠেছিলেন যা নাটকের মহড়ায় কখনও করেন নি। এই দৃশ্যটি নন্দলাল বসুর ‘অন্ধ বাউলের’ ছবি নামে পরিচিত।

রাজা বা ঠাকুরদা বা ফকির আসলে কাহিনীর আড়ালে গড়ে ওঠা সমসাময়িক সমস্যা নিরূপণের প্রতিনিধি। রবীন্দ্রনাথ যে সমস্যার জটিলতা তাঁর সাহিত্যে তুলে ধরতেন তা আদতে শুধু সমকালের নয়; চিরকালীন হয়ে ওঠে। তাঁর রাজারা কখনও লোভের জন্য রাজ্য বাড়ান না। তাঁদের রাজত্বে যেসব লোভী মানুষ আছে তাদেরকে সত্যের পথ দেখিয়েই তৃপ্ত হন। এই লোভী মানুষদের চাহিদা হয় আকাশছোঁয়া। কোনো দমনমূলক পন্থা না নিয়ে রবীন্দ্রনাথ চরিত্রদের এমনভাবে সৃষ্টি করেন যাতে রাজা বা ফকির বা সন্ন্যাসী বা ঠাকুরদা হয়ে ওঠেন মুক্তির সমান চরিত্র যাঁরা অপরাধীকে দমন করেন না, শাস্তিও দেন না বরং ছেড়ে দেন। নচেৎ সহজ থাকা দায় হয়ে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথ ‘ডাকঘর’ লেখার সময় আত্মগ্ন হবার চেষ্টা করেছিলেন। নিজের ফেলে আসা জীবনের দিকে ঘুরে দেখতে চাইছিলেন। সমসাময়িক সময়েই তিনি লিখেছিলেন ‘জীবনস্মৃতি’। রবীন্দ্রনাথের কাছে সবচেয়ে বড় বিষয় হয়ে উঠেছিল প্রকৃতির কাছে মুক্তি পাওয়া। সামাজিক, পারিবারিক ও রাজনৈতিক জীবনের বদ্ধতা ক্লান্ত করে তুলেছিল কবিমনকে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন যে আমাদের জাতির মরণ আসন্ন। নানা রকমের লোভ ও আক্রমণের মধ্যে পড়ে আমরা আত্মকে বিসর্জন দিয়েছি। শুধু নিজেকে নিয়ে আমরা সীমাবদ্ধ। বিশ্ব প্রকৃতির অখণ্ড সত্তা হিসেবে আমাদের অনুভূতি বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। ‘ডাকঘর’ নাটকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাই এক ঈশ্বরকে দেখতে চেয়েছেন। তাঁর মনে হয়েছে এই তাপিত সময়ে একজন ঈশ্বরকে দরকার যিনি এই নাটকের রাজার মতোই আমাদের কাছে একজন রাজকবিরাজকে পাঠিয়ে দেবেন এবং রাজা নিজে এসে আমাদের বন্ধনমোচন করবেন। ‘ডাকঘর’ এর নাট্যগুণ এই চেতনাতে সুপ্ত হয়ে থাকে।

বাংলা ভাষায় লিখিত যেসব নাটক দীর্ঘকাল ধরে বাঙালি পাঠকেরা পড়েছেন এবং পড়বেন তাদের অন্যতম একটি রচনা হল ‘ডাকঘর’। নাটকটি লেখা হয় ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে। গত শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই বলা চলে বাঙালির ছেলে মেয়েরা ছোটবেলা থেকে পাঠ্য পুস্তকের মধ্য দিয়ে অমল ও দইওয়ালার মাধ্যমে ‘ডাকঘর’ এর আংশিক স্বাদ পেয়ে এসেছে। পাড়ায় পাড়ায় রবীন্দ্র জয়ন্তীর যে প্রচলন আছে তাতে অনিবার্যভাবে জায়গা নেয় ‘ডাকঘর’ কারণ প্রতি পাড়াতেই কোনো

না কোনো বালক পাওয়া যায় যাকে অমল সাজিয়ে স্টেজে তুলে দেওয়া হয়। কখনও একটি বালিকাকেও অমল সাজিয়ে অভিনয় করানো হয়। ‘ডাকঘর’ নাটকটির কেন্দ্র একটি শিশু হলেও তা আদতেই শিশুনাট্য নয় সেকথা আমরা প্রারম্ভেই স্বীকার করি।

নাটক শুরু হয় অমলের অসুস্থতা নিয়ে কবিরাজ ও মাধব দত্তের কথোপকথনে। কবিরাজ খানিকটা কৌতুক মিশিয়ে বলেন ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ রাখতে হবে নাহলে বাইরের রোদে, হাওয়ায় অমলের স্বাস্থ্যহানি হতে পারে। মনে হতে পারে বাইরের রোদ, হাওয়া যার জন্য বিষের মত, তাহলে অমল এক ভয়ংকর রোগের কবলে পড়েছে। অমলের বাইরে যাবার উপায় নেই তাই বাইরের বিশ্ব তার জানলার কাছে এসে মিলিত হয়। সে তার নিজের কল্পনা দিয়ে রচনা করে বাইরের পৃথিবীকে। রবীন্দ্রনাথের শৈশবের সঙ্গে অমলের এই কল্পনাপ্রবণ মানসিকতার মিল পাওয়া যায় -

“বাড়ির বাহিরে আমাদের যাওয়া বারণ ছিল; এমন কি বাড়ির ভিতরেও আমরা সর্বত্র যেমন খুসি যাওয়া আসা করিতে পারিতাম না। সেই জন্য বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়াল আবড়াল হইতে দেখিতাম। ... সে ছিল মুক্ত, আমি ছিলাম বদ্ধ,- মিলনের উপায় ছিল না, সেই জন্য প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল।”^২

রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রকৃতি হল রহস্যের মত। তার প্রতি কবির পিপাসা কমে না। সারাজীবন ধরে কবি তপস্যা করেছেন প্রকৃতির গর্ভে মিশে থাকার যেমন করে একটি পিপড়ে মাটির মধ্যে থেকে আশ্বাদন করে নেয় পৃথিবীর রস।

“আমি আত্মাকে বিশ্বপ্রকৃতিকে বিশেষরূপে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কোঠায় খণ্ড খণ্ড করিয়া রাখিয়া আমার ভক্তিকে বিভক্ত করি নাই।

আমি কি আত্মার মধ্যে, কি বিশ্বের মধ্যে বিস্ময়ের অন্ত দেখি না।”^৩

রবীন্দ্রনাথের মনে তৈরি হওয়া পথ ও ঘরের দ্বন্দ্ব অমলের বেদনায় পরিস্ফুট। তার সামনেই খোলা আছে পথ অথচ সে আছে ঘরের মধ্যে আটকে; চলমান জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে। অমলের এই জীবনে বাতাসের মতো এসে পড়ে সুধা। সে শশী মালিনীর মেয়ে। তার পায়ে নিত্য চঞ্চলতা। সে যেন প্রজাপতির মত উড়ে বেড়ায়।

সুধা যখন নাটকে প্রবেশ করে তখন অমল বলে -

“কে তুমি মল বম বম করতে করতে চলেছ, একটু দাঁড়াও - না ভাই!

বালিকা

আমার কি দাঁড়বার জো আছে! বেলা বয়ে যায় যে।

অমল

তোমার দাঁড়াতে ইচ্ছে করছে না - আমারও এখানে আর বসে থাকতে ইচ্ছে করে না।”^৪

এখানে লক্ষ্য করার মত অমলের সংলাপ। সে সুধাকে দাঁড়াতে বললে সুধা নিজের ব্যস্ততার কথা জানায়। অমল বলেছে সুধার যেমন দাঁড়াতে ‘ইচ্ছে করছে না’ তেমন অমলেরও বসে থাকতে ‘ইচ্ছে করেনা।’ অমল কিন্তু নিজের ক্ষেত্রে ‘ইচ্ছে করছেন’ এই ক্রিয়া ব্যবহার করেনা। কারণ সুধার ক্ষেত্রে যেটা ঘটমান বর্তমান, অমলের ক্ষেত্রে সেটাই নিত্য বর্তমান। ঘণ্টার পর ঘন্টা কেটে যায় অমলের এই বদ্ধ ঘরের ঘেরাটোপে। তার কোনো গতি নেই। সুধা যখন ফুল নিয়ে ফিরে আসে তখন অমল তারার আলোয় শায়িত। সুধা চলমান আর অমল স্থানু। ঘর আর পথের দ্বন্দ্ব ‘ডাকঘর’ নাটকের মূল উপজীব্য বস্তু হয়ে ধ্বনিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের অনন্ত বিশ্বাস যে মৃত্যুতে কখনও জীবনের শেষ হতে পারে না। তাই, মৃত্যু কথাটা উচ্চারণ করা হয়নি এই নাটকে। কখনও বলা হয় না যে অমল মারা গেছে। সুধা দৌড়াতে দৌড়াতে আসে অমলের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে। রাজকবিরাজ বলেন অমল ঘুমিয়ে পড়েছে, যখন রাজা এসে ওকে ডাকবেন তখনই অমল জাগবে। এর থেকে স্বাভাবিকভাবেই ধারণা হতে পারে যে এই সেই ঈশ্বরের কথা বলা হচ্ছে। রাজার ডাকেই জীবাশ্ম পরমাশ্মার মধ্যে মিলিয়ে যাবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নাটকে এইটাই মূল কথা নয়। নাটকের শেষ সংলাপ সুধা বলে যে অমলকে সে কথা দিয়ে গিয়েছিল সে ফুল নিয়ে ঠিক ফিরে আসবে।

“সুধা বলে,

তোমরা অমলকে কানে কানে একটি কথা বলো যে ,

সুধা তোমাকে ভোলে নি।”^৫

এখানেই নাটকটি হয়ে ওঠে জীবনুজ্জ্বল। মানুষের প্রতি মানুষের যে সহজ ভালবাসা তার বন্ধন যেন চির অক্ষত হয়ে থাকে সুধার ভালবাসায়। জীবন ও মৃত্যুর অদ্ভুত এই রহস্যময় সম্পর্ক। তার সঙ্গে মিশে আছে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, সময়ের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক। এক গূঢ় গভীর অনুভব ‘ডাকঘর’ নাটককে করে তুলেছে অন্যতম।

অমল প্রবাহমান জীবনকে অনন্ত দেশ কালের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দেখতে চায়। অমলের মন পড়ে থাকে প্রহরীর ঢং ঢং ঘণ্টার আওয়াজে, দইওয়ালার দই বিক্রির সুরে। জানলার ধারে বসে অমল নানা মানুষের সঙ্গে ডেকে ডেকে গল্প জুড়ে বসে। নানা মানুষের নানা কথায় অমলের কল্পনার দৃষ্টি পৌঁছে যায় অনেক দূরের দেশে, কখনও বা মেঠো পথ পেরিয়ে ঝর্ণা তলায়। প্রহরীর থেকে অমল শোনে রাজার ডাকঘর বসেছে তাদের বাড়ির সামনেই। শুনে তারও ইচ্ছে হয় রাজার ডাকঘরকরা হয়ে দেশে দেশে চিঠি বিলি করতে, খবর পৌঁছে দিতে। এতে প্রহরী মনে করে অমল খুব মজার ছেলে। কিন্তু ঘরের বদ্ধতা থেকেই মুক্তি খুঁজতেই অমল প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যেতে চায়। সে এমন কাজই করতে চায় যা তাকে নিয়মে আটকে রাখবেনা, মনের খুশিতে খোলা আকাশের নিচে সে নিজেই মেলে ধরতে পারবে। অমল মাধব দত্তকে জানায় সে আর যাই করুক, কোনোদিনও পুঁথি পড়ে পণ্ডিত হতে চায় না। সে খ্যাপা বাউলের মত পথের সুরে মেতে থাকতে চায়। অমলের জানলার নিচে যে বালকেরা খেলতে আসে তাদের সে নিজের সমস্ত খেলনা দিয়ে দেয় এবং তাদের খেলা দেখেই নিজে খুশি হয়ে যায়। কতটুকুই বা বয়স অমলের! তবু সে অবলীলায় নিজের জিনিস অন্যকে ভালবেসে তুলে দেয় এবং তা আর ফেরৎ চাওয়ার কথাও ভাবে না। সেইসব বালকদের কাছে অমল শোনে রাজার যারা ডাকঘরকরা আছে তাদের মধ্যে দু’জনের নাম শরৎ হরকরা আর বাদল হরকরা। দু’জনের নামেই ঋতুর অনুষ্ণ। শরৎকাল অর্থে নীল আকাশে মেঘ রোদ্দুরের খেলা, তুলোর মতো ভাসা মেঘ, চঞ্চল হাওয়ায় সারি সারি কাশ ফুলের মাথা দোলানো। উল্টোদিকে বর্ষা ঈষৎ মনখারাপের সঙ্গী। কখনও ঝিরঝির করে, কখনও দমক দিয়ে বৃষ্টি আসে। সব ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার শক্তিও তার রয়েছে। এই দুই অনুষ্ণ অমলের কল্পিত দৃষ্টি এবং ঘুমিয়ে পড়ার দ্যোতনা সৃষ্টি করে।

নাটক থেকে জানতে পারি অমল হল মাধব দত্তের স্ত্রীর গ্রাম সম্পর্কের ভাইপো। অমলের মা ছোট বেলায় মারা গেছেন, বাবা গত হবার পরেই মাধব দত্তের স্ত্রী অর্থাৎ অমলের পিসিমা তাকে বাড়িতে এনেছেন। যদিও নাটকে একবারের জন্যেও পিসিমার উপস্থিতি নেই। পিসিমার বাড়ি আসার আগে পর্যন্ত অমলের জীবন বা স্বাস্থ্য বিষয়ে আমরা কিছুই জানি না। কিন্তু আমরা ভেবে নিতে পারি যে অমল আসলে রুগ্ন বালক যেহেতু মাধব দত্ত বলছেন, -

“তার ঐটুকু শরীরে একসঙ্গে বাত পিত্ত শ্লেষ্মা যেরকম প্রকূপিত হয়ে উঠেছে তাতে কোনরকমে এই শরতের রৌদ্র আর বাতাস থেকে বাঁচিয়ে ঘরে বন্ধ করে রাখা।”^৬

অনুমান করতে পারি এখানে আসার আগে হয়ত অমল গ্রামের মাঠে ঘাটে অনেক ঘুরেছে, মানুষজন দেখেছে, তাদের সাথে ভাব জমিয়ে গল্প করেছে। তাই হয়ত দইওয়ালার পাঁচমুড়া গ্রামের দৃশ্য অমল অনায়াসে বলে দিতে পারে এবং এটাও বলে যে তার বোধ হচ্ছে সে যেন সেই গ্রাম দেখেছে। আসলে পল্লী প্রকৃতির সঙ্গে অমলের নিবিড় সখ্যতা তাকে এই অনুভূতির সন্ধান দিয়েছে। এই নিবিড়তা আসলে রবীন্দ্রনাথের। এই পৃথিবী তাঁর কাছে অনেকদিনকার ভালবাসার মানুষের মতো নতুন। তিনি যেন পৃথিবীর শ্যমলীমায় এক হয়ে থাকেন। কবির গায়ের ওপর ঘাস জন্মায়, শরতের রোদ্দুর খেলা করে যায়। কবি সর্বাঙ্গ দিয়ে সূর্যকিরণ আশ্লেষ করে নেন। মনে হয় বহুকালের নাড়ির টান এই পৃথিবী ও কবির মধ্যে।

এরই মধ্যে গ্রামের পঞ্চগনন মোড়ল এসে পড়ে মাধব দত্তের বাড়িতে। অমলকে রাজার চিঠি বলে একটি শূন্য কাগজ দিয়ে রাজার চিঠির প্রত্যাশা জাগিয়ে তুলে ঠাট্টা করেন তিনি। কিন্তু ফকির সেই শূন্য কাগজেই অক্ষর ফুটিয়ে তোলেন অমলের মনে। অমল সহজেই বিশ্বাস করে সত্যি রাজা আসবেন তার কাছে। পরক্ষণেই দেখা যায় রাজদূত রাজার চিঠি নিয়ে আসে এবং জানায় রাজা তাঁর এই ছোট বালক বন্ধুটিকে সঙ্গে করে ঘুরতে বেরবেন। অমল তার আরাধ্য স্বপ্নের ছোঁয়া পায়। অচিরেই তার চোখে নেমে আসে ক্লাস্তির ঘুম। তারপরেই আসেন এক রাজকবিরাজ। তিনি এসে ঘরের দরজা জানলা খুলে দেন। তারার আলোয় অমল ঘুমিয়ে পড়ে। আমাদের মনে হয় অমলের মৃত্যু হয়েছে। কাহিনী আমাদের কাছে খুব

অতিবাস্তব বলে মনে হয় না বটে, কিন্তু এই নাটকের মধ্যে অনেক উপাদান থাকে যা অনুভবে উপলব্ধি করতে হয়। যেমনভাবে কবিতাকে উপলব্ধি করতে হয়। বাস্তব জগতের সঙ্গে তা ঠিক মেলে না।

‘ডাকঘর’ নাটকে অমলকে স্বপ্ন দেখাতে সাহায্য করে ফকির। তিনি ছদ্মবেশী ঠাকুরদা। রবীন্দ্রনাথের অনেক নাটকেই এই চরিত্রটি এসেছে যাঁর নাম ঠাকুরদা এবং স্বভাবে তিনি ঘর পালিয়ে আকাশ লুটে নেওয়ার মানুষ। আমরা যদি এইসময়ে রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য নাটকের দিকে তাকাই তাহলে দেখব ছদ্মবেশ গ্রহণ রবীন্দ্রনাথের কাছে একটা খেলার মত। এই পর্বে লিখিত ‘শারদোৎসব’ নাটকের রাজা বিজয়াদিত্য সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে ছেলেদের সঙ্গে খেলতে বেরোন। ‘ডাকঘর’ এর আগের নাটক ‘রাজা’ তে রাজাকে কখনও প্রকাশ্যে দেখা যায়না কিন্তু ঠাকুরদাকে দেখা যায়। এমনকি সাত রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন আমাদের রাজা, তবু সেখানেও দেখি যোদ্ধার বেশে রাজার বদলে ঠাকুরদার প্রবেশ ঘটে। তখন একটা ভ্রম হয় যে রাজাই কি আসলে ছদ্মবেশী ঠাকুরদা? ‘ডাকঘর’ নাটকে দেখি ঠাকুরদা ফকিরের ছদ্মবেশে এসে অমলের সঙ্গে গল্প করে। যখন মোড়ল অমলকে পরিহাস করে রাজার মিথ্যে চিঠি তার হাতে দিয়ে একমাত্র ফকির সেখানে যেন অক্ষর দেখতে পায়। সে তো আসলে জীবনুজ পুরুষ তাই জীবনের সরলতা সে হারিয়ে ফেলেনি। ‘ফাল্গুনী’ তে গিয়ে দেখা যায় সর্দার আর অন্ধ বাউল আসলে একই সত্তার দুই রূপ। ‘অচলায়তন’ এ যাঁকে শোণপাংশু ও দর্ভকরা বলে দাদাঠাকুর, অন্য একদল বলে গুরু।

ঠাকুরদা অমলের সঙ্গে খেলা করতে আসতে চাননি তিনি তাই ফকির ছদ্মবেশে এসেছেন। ফকিরের কাছে অমল দূরের দ্বীপের রঙিন পাখির গল্প শোনে। তার ইচ্ছে করে ফকিরের চেলা হয়ে এমন সব সুন্দর জায়গায় চলে যেতে। বদ্ধতার উর্ধ্বে এক আশ্চর্য মুক্তির গল্পই ভেসে আসে ‘ডাকঘর’ এর ছত্রে ছত্রে।

এই নাটক অনুধাবন করতে করতে মনে হয় আসলে অসুস্থ কারা? আমরা? সুস্থ কি একমাত্র অমল? সে সব সুন্দরের চোখ দিয়ে দেখতে পায়। অসুন্দর বলে কিছু পায় না। তার মস্ত হুল আমিত্বের উর্ধ্বে উঠে আমিত্বকে প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পারে। চোখ যেখানে পৌঁছয় না, সেখানেও অমলের কল্পনা পৌঁছতে পারে। কল্পনা কোনো শাস্ত্রের নিষেধ মানে না। সে পাখা মেলে উড়ে বেড়ায় ততদূর, যতদূর পর্যন্ত মনের ইচ্ছে চলে যেতে পারে। তাই রাজার চিঠি না আসা পর্যন্ত সেই জীবনের পূর্ণ সমাপ্তি ঘটেনা।

“We live within the shadow of a veil that no man's hand can lift.”^১

আসলে আমরা অবগুণ্ঠনের এক ছায়ার আড়ালে বাস করি তাই আমাদের বিস্তার স্বপ্ন। সেইজন্য এই নাটককে দীর্ঘকাল ধরে রূপক সাংকেতিক নাটক ভেবে আসা হয়েছে এবং এই সমীকরণ পণ্ডিতেরা করেছেন যে অমল হচ্ছে জীবাত্তার প্রতীক আর রাজা হচ্ছে পরমাত্মার প্রতীক। ঘুমের ছদ্মবেশে মৃত্যু আসছে একটা রূপকের মতন। কিন্তু এই পথে যদি ভাবতে হয় তাহলে নাটকের বিস্তার অনেক ছোট হয়ে যায় বলে আমাদের ধারণা। রবীন্দ্রনাথের রাজা ঠিক ঈশ্বর নন। যে রবীন্দ্রনাথ জীবনদেবতার সাধনা করেন সেই জীবনদেবতাও কিন্তু নিশ্চিতভাবে ঈশ্বর নন। তাহলে জীবনদেবতা কে?

যৌবনের কাব্য চিত্রাতে কবি একবার যাঁকে জীবনদেবতা নামে সম্বোধন করেছিলেন (ওই এক বারই), পরে কিন্তু তাঁকে অনির্দেশ্যভাবে ‘তুমি’ বলে ডাকতেন। ‘চিনি নাহি চিনি’ সেই চিরসঙ্গিনী যিনি ক্ষণে ক্ষণে কবির স্বপনচারিণী, তার তিনটি পরিচয় আমরা পাই - স্মারকর্ষময়ী (যৌন আকর্ষণময়ী), মৃত্যুরূপিনি এবং অমৃতদাত্রী।^২

আমরা জানি ১৮৮৪ সালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দায়িত্ব নেবার পর রবীন্দ্রনাথ পৌত্তলিকতা বিরোধী প্রবন্ধ লিখেছেন প্রচুর। ব্রাহ্মমতের বিরোধিতা করেছেন এবং ঈশ্বরকে খুঁজেছেন প্রকৃতির মধ্যে। প্রকৃতি অনন্ত শক্তি হয়ে ধরা দিয়েছে কবিচিন্তে। প্রকৃতি তার নিজের নিয়মে আনন্দে লীলায় মত্ত থাকে। মানুষের ক্ষুদ্রতা মানুষ তা বুঝতে পারে না। সে কখনো কখনো নিজেকে প্রকৃতির থেকেও অধিক শক্তিশালী ভেবে বসে এবং নানা রকম বৈষয়িক কুটকচালীতে মগ্ন থাকে। কিন্তু যাঁরা প্রকৃতি সংলগ্ন তাঁদের চাহিদা আলাদা। তাঁদের মনের বয়স অমলের মত। মুক্তির স্থায়ী ও গভীর মূল্য তাঁরা খুঁজতে চায় পথের ডাকে; ঘাসে ঘাসে ছুটে বেড়ায় তাঁদের বদ্ধ মন। রবীন্দ্রনাথের জীবনের পাঠ প্রকৃতির কাছ থেকে নেওয়া। তাঁর এই শিক্ষাই হল অন্তরের ঈশ্বরের প্রতি নিবেদন। মানুষের হৃদয়বেগ, সৌন্দর্যবোধ তত্ত্বের ব্যাখ্যাকে নাকচ করে রসের অনেকখানি আভাস দিতে পারে। আসল কথাটা হল কোনো রূপের সৃষ্টি করতে গেলেই উপমা বা রূপকের

দরবারে যেতে হয় তার কারণ রূপের একটা সীমা আছে কিন্তু যখনই সেই ভাব সীমা ছাড়িয়ে অরূপের পথে পাড়ি দেবে তখন তা নির্দিষ্ট গণ্ডি পেরিয়ে রূপকের আবরণ ছিড়ে সহজেই মনের বিস্তারকে পৌঁছে দেবে মুক্তির আনন্দে, সহজকে পাওয়ার বিশ্বাসে কিন্তু সমস্যা এখানেই যে সহজ আর সুন্দরের নাগাল পাওয়া কঠিন।

“শুধু দিনযাপনের শুধু প্রাণধারণের গ্লানি

শরমের ডালি,

নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্রশিখা স্তিমিত দীপের

ধূমাক্ত কালি,

লাভ - ক্ষতি - টানাটানি, অতি ক্ষুদ্র ভগ্ন - অংশ - ভাগ,

কলহ সংশয় -

সহে না সহে না আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি

দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়।”^{১৯}

আমাদের বস্তুভিত্তিক মনে বস্তুগত চাহিদা এবং ষড়রিপুর প্রকোপ এতই বেশি যে আমরা তা ত্যাগ করে সুন্দরের প্রতি নিবন্ধ থাকতে পারিনা। অমলের শিশুমনে বস্তু জগতের প্রতি লোভ নেই বলেই সে পিসেমশাইকে জানায় রাজা এলে সে রাজার থেকে ডাকহরকরার কাজ চেয়ে নেবে। মুক্তির জন্য অমলের স্বতঃস্ফূর্ত এই আকুলতা জীবনের সংকীর্ণ বন্ধন পেরিয়ে এক উন্মুক্ত জীবনের ইঙ্গিত দেয়।

আমরা যদি ভেবে দেখি তাহলে বিজ্ঞান দিয়ে এই নাটকের বিচার করা যায়। আমরা প্রশ্ন করতে পারি যে মানুষ আসে কোথা থেকে? মানুষ কোথায় যায় মৃত্যুর পর? মানুষের কি কিছু থাকে? কোথায় সে বিলীন হয়? পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে যাওয়ার অর্থ কি? আমরা যদি এইসব প্রশ্ন সরিয়ে রাখি তাহলে দেখতে পাব ‘ডাকঘর’ আসলে শিল্পীর কল্পনা। এক শিল্পী যেমন সব কিছু হতে পারে, অমলও সবকিছু হতে চায়। সে দইওয়ালার হতে চায়, সে প্রহরীর ঘন্টা শুনে উদাস হয়ে যায়, সে ফকিরের চেলাগিরি করতে চায় এবং সর্বপরি রাজার ডাকহরকরা হতে চায়। এই সময়েই রবীন্দ্রনাথ লিখছেন ‘জীবনস্মৃতি’, নিজের শৈশবের আলেখ্য। বালক অমলের চোখে যেন কবির ফেলে আসা শৈশব উঁকি দিয়ে যাচ্ছে যা মোটেই আমাদের অপরিচিত নয়। সেই ফিরিওয়ালার ডাক, রাত্রে ঘন্টার শব্দ, কল্পনা দিয়ে তৈরি করা নানা ধরণের অনুভূতি। অমল যেন বলে ওঠে, -

“আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী।”^{২০}

এই হল প্রকৃত ‘ডাকঘর’ এর সুর যা রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং এই সুরই কবির জীবনে চিরকাল সমানভাবে বয়ে চলে। তাই ৬২ বছরে পা দিয়ে কবির কেশে পাক ধরলেও মনের মধ্যকার শিশু তখনও সুদূরের জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

মানুষের নিজেদের মধ্যেই আসলে দুটো মানুষ থাকে। আমরা নিজেদের মুক্তির স্বাদ নিতে ভুলে যাই। নিজেরাই নিজেদের নানাভাবে স্থবির করে রাখি। রবীন্দ্রনাথ এই টানাপোড়নের কাহিনী নির্মাণ করেছেন ‘ডাকঘর’ এ। কিন্তু তিনি এই নাটক কোনো কঠিন ভাষার আবরণে চাপা দেননি। বরং আশ্চর্য এক মায়াময় ভাষায় ‘ডাকঘর’ রচনা করলেন যার ভাষা অত্যন্ত আটপৌরে অথচ গভীর। তিনি বিশ্বের পরিচিত দৃশ্য-শব্দ-গন্ধে নতুনের এক অনুভূতি দিলেন যা পরিচিত জিনিসটির মধ্যে থেকেও বিরল অথচ অতি সাবলীল। এই সৌন্দর্য আশ্চর্যভাবে অভ্যেসে ঠাঁই পেত রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট সেইসব সহজ মানুষগুলোর যাপনে। তাই অমল সাধারণ দইওয়ালার দই হেঁকে যাওয়ার সুরে স্বতন্ত্র আনন্দ পায়। অমলের মনে হয়, -

“আকাশের খুব শেষ থেকে যেমন পাখির ডাক শুনলে মন উদাস হয়ে যায় - তেমনি ঐ রাস্তার মোড় থেকে ঐ গাছের সারের মধ্যে দিয়ে যখন তোমার ডাক আসছিল আমার মনে হচ্ছিল - কী জানি কী মনে হচ্ছিল!”^{২১}

অমলের কথা শুনে দইওয়ালা ভাবতে পারে সে এতদিন দই বিক্রি করার মধ্যে কোনো আনন্দ পায়নি কিন্তু দই বেচেও যে সুখ আছে তা এতদিন বাদে তাকে অনুভব করতে শেখায় অমল। তেমনই পাঁচমুড়া গ্রামের পাহাড়, শামলী নদী, গোপবধূর কলসি কাঁখে জল নিয়ে যাওয়া - এ সমস্ত ছবিই অনন্তের এক প্রবাহের মত, অমলের মনে এই ছবি সমুদ্রের ঢেউয়ের মত ওঠানামা করে। বাস্তবের এই যে রূপ একে কেবলই তত্ত্ব কথা বলা চলে না। এ হল শিল্পীর দৃষ্টি। যে দৃষ্টি কোনো ঘেরাটোপে আটকে না থেকে দু-চোখ মেলে জগৎকে আনন্দ করতে পারে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সেই দৃষ্টিকে কখনও ক্ষুদ্র বুদ্ধির গণ্ডিতে বেধে রাখেন নি বলেই বাহ্যবিষয় অতিক্রম করে সব থেকে বড় হয়ে উঠেছে তাঁর সুন্দরের সাধনা। তাই অমলের মৃত্যু সুন্দরের আগমন। কারণ অমলের সৃষ্টিকর্তা জানেন জীবনের একমাত্র সার্থকতা আসে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে। জীবনের প্রথম পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, -

“মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান।”^{২২}

মৃত্যু যেন সেই সুদূরের হাতছানি যার কাছে পৌঁছতে পারলেই জীবন পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। মৃত্যুকে কবি দেখেছেন মাধুর্যময় রূপের বাহারে। মৃত্যুর জন্যই জগতের কোনো ভার নেই। বাস্তবিকভাবে তাই মৃত্যু করণ হলেও কবির কাছে সুন্দর কারণ একদিন না একদিন সংসারের মায়া কাটিয়ে প্রত্যেককে চলে যেতে হবে। কোথাও কিছু থাকবে না। আবার নতুন আসবে, সে পুরনো হয়ে চলে যাবে - এইভাবে চক্রাকারে ঘুরতে থাকবে জগৎ সংসারের জীবন, বিশ্বের সময়ের চাকা, মহাকালের রথ। সেই জন্যই মৃত্যু কবির কাছে বন্ধনমোচনের আনন্দ।

“রাজকবিরাজ - এইবার তোমরা সকলে স্থির হও। এল, এল, ওর ঘুম এল। আমি বালকের শিয়রের কাছে বসব - ওর ঘুম আসছে।

প্রদীপের আলো নিবিয়ে দাও - এখন আকাশের তারাটি থেকে আলো আসুক, ওর ঘুম এসেছে।

মাধবদত্ত - (ঠাকুরদার প্রতি) ঠাকুরদা, তুমি অমন মূর্তিটির মতো হাত জোর করে নীরব হয়ে আছ কেন? আমার কেমন ভয় হচ্ছে। এ যা দেখছি এ সব কি ভালো লক্ষণ? এরা আমার ঘর অন্ধকার করে দিচ্ছে কেন! তারার আলোতে আমার কী হবে!

ঠাকুরদা - চুপ করো অবিশ্বাসী! কথা কয়ো না।”^{২৩}

ঘুম আর মৃত্যুর ব্যঞ্জনাতেই নাটকের অন্তিম দৃশ্য ঘনিয়ে আসে। সুদূরের আকাজ্জা এখানে ধ্বনিত হয়। এখানেই আমাদের মনে পরে প্রহরীর সঙ্গে অমলের কথোপকথনের কিছু অংশ -

“প্রহরী - ঘন্টা এই কথা সবাইকে বলে, সময় বসে নেই, সময় কেবলই চলে যাচ্ছে।

অমল - কোথায় চলে যাচ্ছে? কোন দেশে?

প্রহরী - সে কথা কেউ জানে না।

অমল - ...আমার ভারি ইচ্ছে করছে, ঐ সময়ের সঙ্গে চলে যাই - যে দেশের কথা কেউ জানে না সেই অনেক দূরে।

প্রহরী - সে দেশে সবাইকে যেতে হবে বাবা!”^{২৪}

এখানে প্রহরী যে দেশের কথা বলে তা হল মৃত্যুর দেশ আর অমল ভাবে কোনো এক দূরের দেশের কথা। কবিরাজের বারণ মেনে ঘরের এক কোণে তার বসে থাকতে ইচ্ছে করে না। তাই বাঁধন ভেঙে তৎক্ষণাৎ সে চলে যেতে চায় সেই সুদূরে। সীমা পেরিয়ে অসীমের কাছে আত্মসমর্পণের ইশারা নাটকের মধ্যে একাধিকবার শুনতে পাওয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে ‘ডাকঘর’ এর সমকালে রবীন্দ্রনাথের লেখা চিঠি থেকে জানতে পারি যে কবির মধ্যে এই সময় আবেগের তরঙ্গ জেগে উঠেছিল। তাঁর মনে হচ্ছিল সমগ্র পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে হবে, পৃথিবীর মানুষের সুখ দুঃখের উচ্ছ্বাসের পরিচয় জানতে হবে।

“সে সময় বিদ্যালয়ের কাজে বেশ ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ কি হল। রাত দুটো - তিনটের সময় অন্ধকার ছাদে এসে মনটা পাখা বিস্তার করল। ... আমার মনে হচ্ছিল একটা কিছু ঘটবে, হয়ত মৃত্যু ... কোথাও

যাবার ডাক ও মৃত্যুর কথা ... ‘ডাকঘরে’ ... প্রবেশ করলুম। ... চলে যাওয়ার মধ্যে যে বিচিত্র আনন্দ তা আমাকে ডাক দিয়েছিল।”^{১৫}

বাইরের নানান সমস্যা থেকে কবির মনে এমন অবিচলতা হতে পারে। প্রিয়জনদের মৃত্যুর আঘাতে কবির এই মানসিক দৈন্য দশার আবির্ভাব হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু জানা যায় কবির নিজের শারীরিক পরিস্থিতি কবিমনে এত উদ্বেগ, দোটার জন্ম দিয়েছিল যার কারণে কবির এই অস্থিরতার জন্ম। আমরা যাঁরা অল্পবিস্তর বিজ্ঞান পড়েছি তাঁরা জানি যে মন বলে কোনো বস্তুর উল্লেখ শারীরবৃত্তীয় জীববিজ্ঞানে এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। মন নামক এত অনুভূতিপ্রবণ জিনিস টা থাকে কোথায়? মাথায় নাকি পেটে নাকি হাতে? হৃদয়ের সঙ্গে আমরা মনের একটা সংযোগ করে থাকি বটে কিন্তু সবটাই ভাব, রসের ওপরে নির্ভর করে না। যেকোনো প্রাণীর শরীরের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে বড় ভূমিকা পালন করে প্রধান কতকগুলো হরমোন যেমন অ্যাড্রেনালিন, থাইরক্সিন ইত্যাদি। এরাই মূলত অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। ‘ডাকঘর’ রচনার কাল এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। ‘গীতাঞ্জলি’, ‘গীতালি’ পর্বে লিখিত এই নাটক কবির জীবনের এক স্বভাব বিরুদ্ধ সময়ের রচনা। ‘গীতাঞ্জলি’ কবির অতীন্দ্রিয় জগতের অনির্বচনীয় রসে পুষ্ট।

“সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর, আমার মাঝে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।”^{১৬}

‘গীতাঞ্জলি’ এর কবিতায় এক অদৃশ্য, অজ্ঞাত, অজানা জগতের রূপ, স্পর্শ, গন্ধ দেখতে পাওয়া যায় যা চিরবহমান জগতের বাঁধন ভাঙার খেলায় মাতে। চির অভ্যাসকে দস্যুর মত ভেঙেচুরে দেয়। তাই কবির ঈশ্বর কেবল নিশ্চল, নির্বিকার নন; তিনি জীবনের যাত্রাপথে ক্ষণে ক্ষণে রূপ থেকে অরূপের সন্ধান দেন, পথিক বন্ধ হয়ে দিগন্তের দ্বার খুলে দেন। কিন্তু দেবতার খোঁজ সহজে মেলে না যে! তাই তাঁকে না পাওয়ার সুগভীর বেদনা কবিচিন্তে ছায়াপাত করেছে।

এই সময়েই কবির কিছুদিন ধরে এক ধরণের শারীরিক ব্যমো চলেছিল। নার্ভাস ব্রেকডাউনের ফলে রবীন্দ্রনাথের কানের এবং মাথার বাঁ দিকে ব্যথা করত। সেজন্যই মনের মধ্যে একটা গভীর বেদনা আর অশান্তি লেগেই থাকত অকারণে। ডাক্তার যুম্যান কবির চিকিৎসার জন্য ‘অরাম’ নামক একটি ওষুধ দিয়েছিলেন। এই ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ায় প্রচণ্ড তন্দ্রায় কবির স্নায়ু শিথিল হয়ে আসে এবং নিজের প্রতি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যায়। এই ওষুধে রবীন্দ্রনাথের কানের ব্যথা সেরে যায় বটে কিন্তু প্রচণ্ড মানসিক সমস্যায় কবির অস্থিতি বোধ বেড়ে যায়। বিষাদ, মৃত্যুভয়, বেদনা, সর্বত্র প্রতিবন্ধকতার ভয়, আশাহীনতা, আত্মহনন, মরিয়া হয়ে ওঠা, বিবেকের সঙ্গে নিয়ত বিরোধ, অসন্তোষ প্রভৃতি কবিকে চেপে ধরে। দিনরাত্রি কবির মনের মধ্যে মৃত্যুর ইচ্ছে তাড়া করে বেড়াতে আরম্ভ করে। তাঁর মনে হত জীবনটা যেন আগাগোড়া শূন্য হয়ে গেল। নিজের কর্তব্য বোধের ওপরেও সন্দেহ জাগত। মনে হত বুঝি সংসার, বিদ্যালয়, জমিদারি, দেশ - সবকিছুর জন্যে প্রকৃত কাজ করা হয়ে ওঠেনি। অন্যদিকে মনের মধ্যে প্রিয়জনদের নিয়ে অকল্যাণ চিন্তা ভীষণভাবে তোলপাড় করে তুলেছিল। অন্ধকার থেকে আলো খুঁজে পেতে কবি নিজেই ‘মেটেরিয়া মেডিকা’ খুলে সেই অরাম এর লক্ষণ দেখে নিশ্চিত হয়েছিলেন যে তিনি কেন জীবনে তৃপ্তি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। কিন্তু নিজের মনের জোরে এই অবস্থা অতিক্রম করে ফের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

চারিদিকের ক্ষুদ্র বেগুনী থেকে বেরিয়ে পড়তেই রবীন্দ্রনাথ ‘ডাকঘর’ এর ডাক শুনতে পেয়েছিলেন। সে হল পথের ডাক। তাই ‘ডাকঘর’ এর ভাষা অনির্বচনীয়। এই ভাষা অন্য কারুর হাতে সৃষ্টি হতে পারবে না। কবির দরদ দিয়ে লেখা এই নাটক তাই স্থান কাল ভেদে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাটকের মর্যাদায় ভাস্বর হয়ে থাকবে।

Reference:

১. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত আনন্দ সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৩৮৮, ‘রবীন্দ্রজীবনকথা’, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড পৃ. ৬১
২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৯৬, ‘জীবনস্মৃতি’, ‘রবীন্দ্র রচনাবলী একাদশ খণ্ড’, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ৮
৩. তদেব, পৃ. ১৩২

৪. সমাদ্দার, শেখর, প্রথম প্রকাশ ৬ অগাস্ট ২০২২, 'আধুনিকতা ও বাংলা থিয়েটার', মৌহারি, পৃ. ৫৫৪ - ৫৫৫
৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, প্রথম প্রকাশ ১৩১৮, 'ডাকঘর', বিশ্বভারতী, পৃ. ৭৩
৬. তদেব, পৃ. ১১
৭. চক্রবর্তী, অজিতকুমার, ১৩৮০, 'ডাকঘর', 'কাব্যপরিক্রমা', বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, পৃ. ৫৮
৮. রায়, রজতকান্ত, ১৭ অগাস্ট ২০২৩, 'তিমির অবগুণ্ঠনে', 'দেশ', সুমন সেনগুপ্ত (সম্পা.), পৃ. ৪৮
৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, পুনর্মুদ্রন পৌষ ১৪১৫, 'বর্ষশেষ', 'সঞ্চয়িতা', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ৩১৯
১০. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, প্রথম খণ্ড - দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে প্রকাশ ২৫ বৈশাখ ১৩৯৯, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে প্রকাশিত 'গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচি' পৃ. ৯৯
১১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, প্রথম প্রকাশ ১৩১৮, 'ডাকঘর', বিশ্বভারতী, পৃ. ২৪
১২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, পুনর্মুদ্রন পৌষ ১৪১৫, 'মরণ', 'সঞ্চয়িতা', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, পৃ. ২৯
১৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, প্রথম প্রকাশ ১৩১৮, 'ডাকঘর', বিশ্বভারতী পৃ. ৭১
১৪. তদেব, পৃ. ২৮
১৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, প্রকাশ ২৫ বৈশাখ ১৪০৮, 'ডাকঘর', 'রবীন্দ্র রচনাবলী ষোড়শ খণ্ড', পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ৬৮৮
১৬. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, প্রথম খণ্ড - দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে প্রকাশ ২৫ বৈশাখ ১৩৯৯, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে প্রকাশিত 'গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচি', পৃ. ১৩০